দৈনিক জনকণ্ঠ

25

তারিখ 04 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

বাংলাদেশের সাক্ষরতার চিত্র

সৈয়দ আলী কবীর

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটা শিক্ষিত দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন হয় শিক্ষার মাধ্যমে। তবে দেশকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পূর্বে তার সাক্ষরতার হারকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটা প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে হয়। সাক্ষরতা ও শিক্ষা সমার্থক নয়।

কেন সাক্ষরতা ও শিক্ষা সমার্থক নয়, সে কথা একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। সাক্ষরতার অর্থ হলো যে লেখাপড়া সম্বন্ধে মানুষের একটা ন্যূনতম জ্ঞান থাকবে। কিন্তু ন্যূনতম জ্ঞান নিয়েই মানুষ শিক্ষিত হতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে সাক্ষরতার চাইতে অনেক বেশি কিছু দেয়। তাকে জ্ঞান চর্চার জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, তার মানসিকতার প্রসার ঘটায় ও মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

বলা হয় যে, কেবল সাক্ষরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নেই। কারণ একটা দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করলেই সে দেশ উন্নতির পথে যাবে না। পৃথিবীতে কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে একটা দেশের সাক্ষরতার প্রসার ঘটেছে কিন্তু উন্নয়নের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তানজানিয়া ও ইথিওপিয়া এমন দুটো দেশ যেখানে সাক্ষরতার হার উঁচু হলেও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সন্তোষজনক নয়। কারণ তারা যদিও নিজেদের দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করেছে, কিন্তু তারা দেশকে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি। তবে যেসব দেশে শিক্ষিত মানুষের হার সন্তোষজনক সেখানে মানব সম্পদের গুণগতমান যথেষ্ট সন্তোষজনক।

প্রশ্ন হলো, কিভাবে আমরা নির্ধারণ করব যে দেশ যেমন সাক্ষরতা অর্জন করেছে তেমনি শিক্ষিত হয়েছে। আমি এই বিষয়ে একটা মানদণ্ড নিচ্ছি। অনুমান করি কোন দেশে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা যদি সন্তোষজনক হয় তাহলে তারা কেবল নিরক্ষরতামুক্ত হয় না, তারা শিক্ষিত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ জাপান ও কোরিয়ার মতো দেশে প্রায় সব ছেলে মেয়ে ন্যূনপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করে। আর এইসব দেশে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেবার হারও যথেষ্ট সন্তোষজনক।

তবে শিক্ষার পথে এগুতে হলে দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতে হয়। কারণ কোন দেশ নিরক্ষরতামুক্ত না হলে শিক্ষিত হবে না।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের একটা আঞ্চলিক ভিত্তিক ছবি দিব। কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছি। আমরা পরিসংখ্যান থেকে কোন প্রমাণ পাব না যে দেশ কতটা শিক্ষিত হতে পেরেছে। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ৭ বা ততোধিক বয়সের মানুষের সাক্ষরতার হার ৩২.৪ শতাংশ। বিভাগ অনুযায়ী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগে সাক্ষরতার হার ৩৯.৬ শতাংশ। চট্টগ্রামের সাক্ষরতার হার ৩২.৮ শতাংশ। সিলেটের সাক্ষরতার হার ২৭.৯ শতাংশ। ঢাকার সাক্ষরতার হার ৩৩.৫ শতাংশ। খুলনার সাক্ষরতার হার ৩৩.১ শতাংশ ও রাজশাহীর বেলায় সংখ্যাটি হলো ২৭.১ শতাংশ।

আমি এই পরিসংখ্যান নিয়েছি বাংলাদেশের ১৯৯৫ সালের Statistical Pocket Book থেকে। এ বইটি থেকে থানাওয়ারী সাক্ষরতার হারও পাওয়া যায়। সেখান থেকে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চল এখনও ভীষণ নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে। বাংলাদেশের বহু থানার সাক্ষরতার হার কম বেশি ২০ শতাংশ। তবে অনেক অঞ্চল আছে যেখানে সাক্ষরতার হার তার চেয়েও কম। যেমন সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার বেলায় এই হার মাত্র ১২.৩ শতাংশ ও গোয়াইন ঘাট অঞ্চলে ১৫.১ শতাংশ। এমন হতাশাব্যঞ্জক সাক্ষরতার হার আরও বহু অঞ্চলের বেলায় পাওয়া যাবে।

তবে থানাওয়ারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে, কিছু কিছু থানার সাক্ষরতার হার দেশের গড় পড়তার সাক্ষরতার হারের চাইতে অনেক বেশি সন্তোষজনক। ঢাকার ধানমন্ডি থানার সাক্ষরতার হার ৭১.৭ শতাংশ, মতিঝিল থানার ৭০.৯ শতাংশ, রমনা থানার ৫৯.৩ শতাংশ এবং তেজগাঁও থানার ৬৮ শতাংশ। মোটের ওপর ঢাকা নগরে অবস্থিত প্রায় সব থানারই সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক।

তবে প্রদীপের নিচেও অন্ধকার থাকে। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৭.৭ শতাংশ ও সাভারের বেলায়ও তাই। ঢাকা নগরের বাইরে ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানার সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। ঢাকার বিভিন্ন থানার পরিসংখ্যান থেকে একটা কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেসব অঞ্চল আর্থিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাদের সাক্ষরতার হার যথেষ্ট উঁচু। কিন্তু যেসব অঞ্চল আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে নেই তাদের সাক্ষরতার হার অনুজ্জ্বল। যেহেতু আমাদের দেশে মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, সেহেতু সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে গেলে দেশের সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষা অবধি একটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। তবে সেই সঙ্গে শিক্ষার হারের প্রসার ঘটাতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা অবধি একটা শক্তিশালী নীতি প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটু ধারণা দেয়া যাক। ১৯৯৫ সালের Statiscal Pocket Book থেকে দেখা যায় যে ১৯৯২-৯৩ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৯৪২। পরের বছরই দেখা যায় যে সংখ্যাটির বিরাট প্রসার ঘটল। দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫,৮৮৬। দুই সংখ্যার মধ্যে পার্থক্যের কারণটা পরিসংখ্যানের পাদটিকায় বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালের বেলায় NGO-দের দ্বারা পরিচালিত স্কুলের পরিসংখ্যান নেয়া হয়েছে। পূর্বের বছরের পরিসংখ্যানে NGO চালিত স্কুলের সংখ্যা ছিল অনুপস্থিত।

আমি মনে করি যে, আমাদের সরকারী পরিসংখ্যানে সরকার চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও NGO চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান পৃথকভাবে দেয়া প্রয়োজন। কারণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ফর্মাল প্রতিষ্ঠান। তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। কিন্তু NGO পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। আর মনে রাখতে হবে, যেহেতু আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, তাই উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের শিক্ষার জন্য কতটা পর্যাপ্ত তার হিসাব জানা প্রয়োজন। এনজিওদের উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়ে সে দুর্বলতা ঢাকা হবে অনুচিত।

আমাদের NGO পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ছোট ছবি এখানে দিচ্ছি। তার জন্য আমি নির্ভর করছি গণস্বাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত Directory of Education Programmes of the NGOS-এর ওপর। বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিকভাবে ৪১৫টি এনজিও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা রেখেছে। তারা সর্বমোট ৮৬,৩৬৭ কেন্দ্র পরিচালনা করে। তারা সর্বমোট ২৫,১০,৪৯০ শিশুকে শিক্ষা দেয়, যার মধ্যে ১৭,১৩,৩৮১ হলো মেয়ে ও ৭,৯৩,৫৮০ ছেলে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম টিকে থাকে। তাই উপআনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি।

তবে সংখ্যার দিক দিয়ে বহু NGO কাজ করলেও মাত্র গুটিকয়েক NGO শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রাখছে। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উজ্জ্বলতম অবদান রেখেছে ব্র্যাক। তারা ৩০১টি থানায় ৩০,২১১ শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে ও তাদের মাধ্যমে ৯,৮১,৯৪৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়। ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী মেয়ে। অন্য NGO-রা, যারা উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, তারা এককভাবে তেমন শক্তিশালী নয়। তবে সার্বিকভাবে তারা যথেষ্ট অবদান রাখছে। ব্র্যাক ছাড়া অন্যান্য NGO ৫৬,১৫৬ শিক্ষাকেন্দ্র চালায়।

এখন আমাদের সামনে মৌলিক প্রশ্ন দাঁড়াল যে, কিভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের ধরে রাখা যায়। যখন আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব, তখন উপ-আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নিজে থেকে কমে আসবে।

আওয়ামী লীগ সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করবে। এই প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে সামনে বছর দুই-একের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। আর যেসব নিরক্ষর ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে থাকবে তাদের জন্য শক্তিশালী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে NGO-রা কি ভূমিকা রাখছে, সে ব্যাপারে সরকারের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।

গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ যথেষ্ট নয়। তার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আর যতদূর সম্ভব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য একটা জাতির কর ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য অর্থ যোগান দিতে হবে। কিন্তু যারা মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা করবে তাদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তাদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে হবে। নইলে প্রাথমিক স্তর পার হবার পর আপামর জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। ১৯৯১-৯২ সালে দেশের স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯,৮৯২ ও তার পরের বছর ছিল ১১,০৯৫। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে অনধিক ৪৫ লাখ শিশু পড়ালেখা করছে। আমি Statistics Pocket Book থেকে দেখছি যে, সংখ্যাটি ১৯৯২-৯৩ সালে ৪১,৫১,০০০ ছিল। সংখ্যাটিকে বর্তমানে আনুমানিক ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ করে আমি ৪৫ লাখে উপনীত হয়েছি।

তবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে শিক্ষার্থীর হার ছিল ১ কোটি ৬৭ লাখেরও বেশি। অতএব আমরা যদি সারা দেশকে শিক্ষিত করতে চাই তাহলে মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তত দেড় কোটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য, সামনে ১০ বছরের মধ্যে এই চ্যালেঞ্জও আসবে।

আমার আলোচনা থেকে দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসছে। নিরক্ষারতার হারকে দূর করতে হবে, প্রাথমিক ব্যবস্থার শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে হবে। তবে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে হলে মাধ্যমিক ও পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

বর্তমানে কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষার স্বীকৃতি দিয়েছি। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিনি। অথচ সব উন্নত দেশে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি অবৈতনিক। আর ইউরোপের বহু দেশে শেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক। তবে তার মানে এই নয় যে, সবার জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার খোলা আছে। তাদেরই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়, যাদের মেধার দিক থেকে সেই শিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দেশের জন্য প্রয়োজন। আর যারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে না, তাদের জন্য দু'বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সেই আয়োজন করতে পারলেই আমরা দেশকে শিক্ষিত করতে পারব ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নের ভিতকে শক্তিশালী করতে পারব। এখানে একটা উহ্য কথাই বলে শেষ করব। সাক্ষরতার যুদ্ধে Pre-primary education-এর অবস্থান কি হবে! ব্যাপারটা দুই কারণে অবহেলা করা যায় না। প্রথমত নিরক্ষর পরিবারের শিশুদের কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মানসিক দিক থেকে তৈরি করা যায়। শিক্ষিত পরিবারের ব্যাপারটা শিশু জন্মাবার পর পরই আরম্ভ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত বিষয়টা নারী মুক্তির জন্যও অপরিহার্য। কারণ "শিশু পালন কেন্দ্র" ছাড়া আধুনিক মায়েদের পক্ষে কর্মজগতে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুইডেনে এহেন কাজ সম্পন্ন করে ড্যাগহেম যা উচ্চারণে ডগ্‌হেম। চলতি কথায় তাদের ডাগিস বলে।

প্রাচ্যে পরিবারকে স্বাভাবিক ডগিস বলা চলে। কারণ সেখানে নানা-নানি, দাদা-দাদি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। তবে আধুনিক পিতামাতা অত্যন্ত সচেতন যে, তার ফলে শিশুটির মাথা না গুলিয়ে যায়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু পালন কেন্দ্রের স্থান নিরূপণ অত্যন্ত সুকঠিন। কিন্তু কাজটি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করা অবশ্যই প্রয়োজন।